SEMESTER-4
PAPER:CC-8
MODULE-3
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

শাক্ত পদাবলীর জনপ্রিয়তা নিরিখে আগমনী ও বিজয়া:

শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই শাক্ত পদাবলীর সমৃদ্ধি ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই শাক্ত পদাবলী রচিত হওয়ার পেছনে সামাজিক যে পটভূমি ছিল সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। তখন থেকেই মুঘল শাসনের ভিত্তি আস্তে আস্তে শিথিল হতে থাকে। বাদশাহের নামমাত্র সনদ নিয়ে উশৃংখল অকর্মণ্য কিছু নবাব বাংলার সিংহাসনে বসেছেন। এদের কুশাসনে দেশের সর্বত্র অরাজকতা দেখা যায়। সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে তাদের জমিজমা কেড়ে নেওয়া হয় এবং নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় দেশের জমিদারেরাও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।জমি জমা কেড়ে নেওয়া হতে থাকে এবং নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। করের ভারে জনসাধারণ পীড়িত। আবার বিনা পারিশ্রমিকে প্রজাদের বেগার খাটিয়ে নিয়েছে জমিদার।। বিচারের নামে চলতে থাকে প্রহসন। এ সমস্ত কিছুর চিত্রই আমরা শাক্ত পদাবলীতে পাই। বিপন্ন মানুষ দিশেহারা হয়ে সন্ধান করে কোন এক বরাভয়দাত্রী শক্তির, যে শক্তি তাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সেই আশ্রয় তখন খুঁজে পায়নি। মহাপ্রভুর তিরোধান এর পর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাবে বৈষ্ণবীয় জীবনে অনাচার ও নৈতিক শৈথিল্য দেখা দেয়। তখন অত্যাচার ও পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করুণাময়ী জগত জননী দেবী কালিকাকে পরম নির্ভরস্থল জেনে শাক্ত কবিরা শাক্ত পদাবলী রচনা করলেন। জনগণ সরল মনে বিশ্বাস করলো কালিকা আশ্রয়ে কোন ব্যভিচার নেই, হিংসা নেই, আছে প্রেম করুণা। রাজা যখন দুর্বল বিচার সভা যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে তখন মায়ের এজলাসই অভিযোগ জানাবার প্রকৃত জায়গা। তাই শাক্ত কবিরা হাজার রকমের অভাব অভিযোগ অনুযোগ-অনুনয় আবদার নিয়ে নিজেদের কথা ও সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ের কথাকে শাক্ত কবিতা শাক্ত পদে উৎসারিত করে দিয়েছেন।

শাক্ত পদাবলী প্রকৃতপক্ষে শক্তি তত্ত্বের সংগীত গীতি। শাক্ত কবিরা সাধক কবি। সাধনালব্ধ সত্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তারা কাব্য সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন।দুরুহ জটিল তত্ত্বকে তারা নিত্য প্রচলিত ঘরোয়া ভাষায় লোকজীবন থেকে সংগৃহীত উপমা রূপকের চিত্রকল্পের সাহায্যে মুর্ত করে তুলেছেন। আসলে শাক্ত পদাবলীতে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। ব্রহ্মময়ী

আদ্যা শক্তি ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মা হয়ে উঠেছে না। শাক্ত কবিরা অনেকেই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তবে শাক্ত পদাবলীতে তন্ত্রসাধনার পশুভাব ও বীরভাবের প্রসঙ্গ নেই।। সাধক কবিরা বামাচারের সাধন স্তর অতিক্রম করে দিব্য ভাবের লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। তথ্য ও জীবনরসের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে এখানে। দেবতারে প্রিয় করা বা প্রিয়কে দেবতা বানানো ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সত্য খুঁজে পেয়েছিলেন অর্থাৎ 'দেবতার প্রিয় করি, প্রিয় রে দেবতা'শাক্ত পদাবলীতেও আমরা সেই সত্যটুকু উপলব্ধি করি। তবে তাতে দেবতার দেব সত্তা এতোটুকু ম্লান হয়নি। কেবলমাত্র লীলা নয় লীলা ও তত্ত্বের অদ্বৈত সন্ধি এই শাক্ত পদাবলী। উমা সেখানে সাধারণ মেয়ের মত চাঁদ ধরার বায়না করলেও তিনি সামান্য নন। কবিরা তা বারবার মনে করিয়ে দিতে ভুলেন নি।। শাক্ত সংগীত গুলি পদকর্তাদের হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয়েছে। আর এজন্য এর দুরুহতত্ত্ব হয়ে উঠেছে সহজ। পারিবারিক জীবনের তুচ্ছ বিষয়ের অভিজ্ঞতা ,সমাজ চেতনা, লোকজীবনের পাশা খেলা, শিকার করা ,কলুর বলদের ঘানি টানা, এমনকি ভানুমতির ভেলকিও তারা অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছে ন। ধর্ম পথ পরিক্রমা করতে করতে শাক্ত পদকর্তারা বিশেষ বস্তুনিষ্ঠ ও মর্ত প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এর কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

পৌরাণিক পটভূ ভূমিকায় রচিত হলেও আগমনীয় বিজয়া সংগীত বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গীত। এই পথগুলিতে বাঙালির পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের সুর অতি করুন ও মধুর রাগিনী তে ঝংকৃত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর হিমালয়, মেনকা, উমা, শিব তারা কেউই দেবতা নন সকলেই আমাদের অতি পরিচিত বাংলাদেশের নরনারী। আগমনী বিজয়া গানে মেনকা হলেন আমাদের বাংলাদেশের হতভাগিনী কন্যার বিচ্ছেদ কাতরা, স্নেহ পরায়ণা বঙ্গ জননী। আর এখানে স্বর্গ নেমে এসেছে বাঙালির ঘরের উঠোনে। কমলাকান্ত অজস্র পদ রচনা করে আগমনী ও বিজয়া কে দৃশ্যকাব্য বা নাটকের মত লক্ষ্যগোচর করে তুলেছেন।

গিরিরানি মেনকার একমাত্র কন্যা উমা। দেখতে দেখতে এই উমা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করে। কন্যার বিবাহ বাঙালির প্রতি ঘরের সমস্যা। মন মত পাত্র পাওয়া কঠিন। তবুও বাধ্য হয়ে আদরের কন্যা কে স্বামী গৃহে পাঠিয়ে বঙ্গ জননীরা যেভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন ঠিক সেই চিত্রই আমরা শাক্ত পদাবলীতে লক্ষ্য করি। কন্যা উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ করে মা মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তখন থেকেই শুরু হয় অশ্রু বিসর্জনের পালা। একান্নবর্তী পরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমনকি নামমাত্র আত্মীয়কেও বেঁধে রাখতে চাই। কেবল কন্যাকে বিদায় দিতে হয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাঙালি মায়ের মত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে মেনকা-

“আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে

গিরিরাজ অচেতনে কত না ঘুমাও হে”।

আসলে মেনকা শুনেছেন জামাতার শিব বিত্তহীন ভিখারি। উপরন্ত উমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়। এ কথা শোনার পর থেকেই মেনকা উতলা। শুধু মেনকা নয় আমাদের ঘরের মায়েদেরও এই এক অস্থির ভাবনা।

বছরে একবার শরৎকালে উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসেন। এই দিনগুলি র জন্য সাধারণ বাঙালি মায়েদের মত মেনকার অধীর প্রতীক্ষা। আবার কখনো বিচ্ছেদ কাতরা মাতার মনে হতো যদি জামাইকে চিরদিনের জন্য গৃহস্থান দিতে পারতেন তবে আর কন্যার জন্য কোন উৎকণ্ঠাই থাকতো না। বঙ্গজননীর এই কামনাই শাক্তপদাবলীর একটি পদে ফুটে উঠেছে।

“আমার মনে আছে এই বাসনা
জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে
গিরিপুরে করব শিব স্থাপনা।“

অবশেষে আকাশে যখন দেখা দেয় শরতের মেঘ গাছে গাছে ফুটে ওঠে শুভ্র শেফালী তখন শরৎকালের দিকে তাকিয়ে মায়ের বেদনা অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। আসন্ন মিলনের আকাঙ্খায় মেনকা আনন্দে অধীর। বারবার গিরিরাজকে গিয়ে অনুরোধ জানায়

“যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী”।

গিরিরাজ ধৈর্যশীল মানুষ। তিনি জানেন স্বামী কন্যার সর্বস্ব। জামাতা শংকর সহজে উমাকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন বলে মনে হয় না। কারণ এক মুহূর্ত উমাকে না দেখে শিব থাকতে পারে না। তাই মেন কাকে গিরি রাজ জানায়

“তিলে না দেখিলে মরে
সদা রাখে হৃদি পরে
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে”।

অবশেষে মেনকার ব্যাকুল আবেদনে সারা দিয়ে গিরিরাজ চললেন কৈলাসপুরে। পিতার মুখে মায়ের ব্যাকুলতার কথা শুনে মায়ের স্নেহ ডোরে ফিরে যাওয়ার জন্য উমা শঙ্করের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কমলাকান্ত অসামান্য দক্ষতায় উমার মনোভাব টি তুলে ধরেছেন

“গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর কর অনুমতি হর
যাইতে জনক ভবনে”।

মেনকার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে উমা আসেন পিতৃগৃহে। যথারীতি সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মেনকা কন্যাকে বরণ করেন।

এই সকল কাহিনী চিত্রনে কোথাও অতিরঞ্জন নেই। বাঙালি পল্লী বধুর কোমলধর্ম তার সরল প্রাণের তরল মর্ম কবি কণ্ঠে এমন মধুর স্বরে ঝংকৃত হয়েছে যা আমাদেরকে এক অনাস্বাদিত পূর্ব রসের সন্ধান দিয়ে রস পিপাসাকে চরিতার্থ করে।

বহুদিনের অতন্দ্র প্রতীক্ষার পর ক্ষণিক মিলনের আনন্দে মেনকার হৃদয় যখন উদ্বেলিত তখন সহসা নবমীর মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। তিনদিনের মিলনের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নবমীর দিন থেকেই বিজয়ার করুন সুর বেজে উঠে। রাত্রি শেষে মায়ের ঘর শূন্য করে আবার এক বছরের জন্য উমা যাবে পতিগৃহে। তাই মেনকার নবমী রাত্রিকে চলে না যাওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানায়। কিন্তু নবমী রাত্রি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। নবমীর রাত শেষ হয় দশমীর প্রভাতে। ডমরু বাজিয়ে শিব উমাকে নিতে আসেন। মেনকার মাতৃ হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তবে এই ক্রন্দন শুধু মেনকার একার নয় প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরবার জন্য পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে অনন্তকাল ধরে এই ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এগুলোর মধ্যে তত্ত্বকথা থাকলেও মানবিক অনুভূতির লীলায়িত অভিব্যাক্তি ঘটেছে। আগমনী গানে রয়েছে সন্তান স্নেহ ব্যাকুলা মাতৃহৃদয়ের আর্তি। মাঝখানে মা ও মেয়ের মিলন আনন্দের দৃশ্য। আবার কন্যা বিরহ সেই আনন্দ-বেদনাকে আরো প্রগাঢ় ও ব্যাকুল করে তুলেছে। আবেগ উৎকণ্ঠা মিলন বিরহের মধ্যে কমলাকান্ত মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বাৎসল্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আর এভাবেই আগমনী বিজয়া গানে স্বর্গ মর্ত্য একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য -শংকরীপ্রসাদ বসু।
২। শাক্ত পদাবলী- জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
৩। শাক্ত পদাবলী- অরুণকুমার বসু
৪। ভারতের শক্তি সাধনা ও শক্তি সাহিত্য- শশীভূষণ দাশগুপ্ত
৫। বাংলার কাব্য- হুমায়ুন কবির